কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর):

সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিল্‌স
BANGLADESH INSTITUTE OF LABOUR STUDIES-BILS

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর):
সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর):

সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা

প্রকাশনা উপদেষ্টা
রায় রমেশ চন্দ্র
শিরীন আখতার, এমপি
ড. মাহফুজুল হক
এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসেন খান
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
শাকিল আখতার চৌধুরী
কোহিনুর মাহমুদ
নাজমা ইয়াসমিন
মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব

প্রকাশনা উন্নয়ন
মোঃ ইউসুফ আল-মামুন
জেসমিন জুই

প্রথম প্রকাশ
জুন, ২০১৭

ISBN: 978-984-34-2814-5

মুদ্রণ
সারকো মিডিয়া এইড সার্ভিসেস
৮৫/১, সাফায়াত উল্লাহ লেন
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিল্‌স)
বাড়ি-২০, সড়ক-১১ (নতুন), ৩২ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন : ৮৮০-২-৯০২০০১৫, ৯১২৬১৪৫, ৯১৪৩২৩৬, ৯১১৬৫৫৩
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৮১৫২৮১০, ই-মেইল: bils@citech.net
ওয়েব: www.bilsbd.org

সূচীপত্র

১.	প্রাক কথন	০৫
২.	সংজ্ঞা ও পরিচিতি	০৭
৩.	প্রেক্ষাপট, অনুসরণীয় ও অনুশীলন	০৯
৪.	সিএসআর এর মানদন্ড	১১
৫.	ট্রেড ইউনিয়নের মতামত	১৭
৬.	সিএসআর ব্যয় নয়, বিনিয়োগ	১৮
৭.	কার দায়িত্ব, কার প্রাপ্য	১৯
৮.	বিভিন্ন পক্ষের সুপারিশ	২১

প্রাক কথন

বাংলাদেশে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা-সিএসআর কার্যক্রম সর্ম্পকে ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রমিক কর্মচারিদের অবহিতকরণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিল্‌স উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিএসআর কার্যক্রমকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী কার্যকর করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার এবং শ্রমিকদের কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় সিএসআর কার্যক্রম যাতে অধিকতর অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে মানদন্ড তৈরি করার জন্য বিভিন্ন দেশের সিএসআর আইন ও নীতিমালা, পাশ্ববর্তী দেশের সিএসআর আইনের উদাহরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দলিলপত্রের আলোকে বিল্‌স একটি জাতীয় নীতিমালা প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রধান উন্নয়ন অংশীদার সেহেতু সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা আর্ন্তজাতিক নীতি ও নিয়ম অনুযায়ী নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি প্রেসার গ্রুপ ও সহযোগী থাকা প্রয়োজন। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এর গাইড লাইন্‌স অনুসরনে করে থাকে বাংলাদেশ। এ ক্ষেত্রে সিএসআর সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসরনে বাংলাদেশকে উদ্যোগী করে তোলা প্রয়োজন। এ ছাড়া বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও ব্যবসার অবাধ প্রসার ও প্রচলন নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ অন্যান জোটের নির্ধারিত সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমের প্রচলন করাও প্রয়োজন।

শ্রমিক ও কর্মচারী, যারা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার তাদেরকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের উপকারভোগী হিসেবে অর্ন্তভূক্ত করার জন্য এ্যাডভোকেসি করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ শ্রমিকদের অংশগ্রহণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সুতরাং, ট্রেড ইউনিয়নকে সিএসআর বিষয়ে সাম্যক ধারনা প্রদান করা, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক নীতিমালা সম্পর্কে ধারনা দেওয়া এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সাথে সফল আলোচনা বা দরকষাকষির জন্য তাদের প্রস্তুত করে তোলারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ বিষয়গুলোকে বিবেচনায় রেখে সিএসআর বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে বুকলেটটি প্রকাশ করা হয়েছে।

নজরুল ইসলাম খান
মহাসচিব

মোঃ হাবিবুর রহমান সিরাজ
চেয়ারম্যান

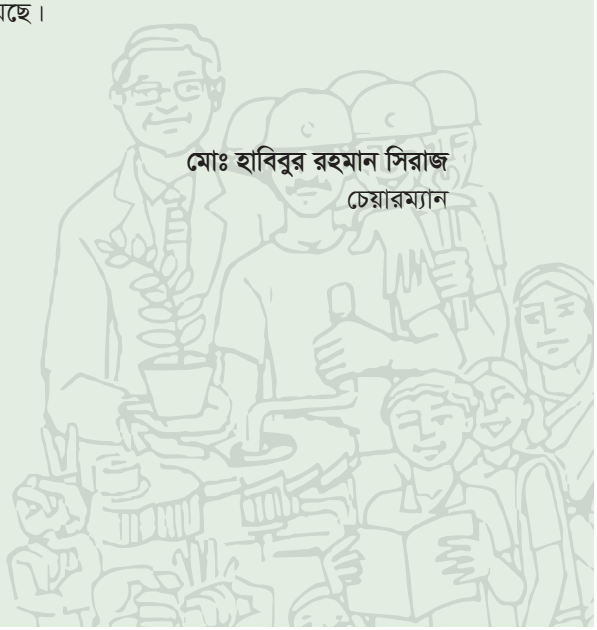

সংজ্ঞা ও পরিচিতি

সিএসআর কি?

সামাজিক দায়বদ্ধতা বা কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা বা সিএসআর হল একধরনের ব্যবসায়িক শিষ্ঠাচার বা নীতি যা সমাজের প্রতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনকে ব্যবসায়ের নিয়মের মধ্য অন্তর্ভুক্ত করে। একটি ব্যবসা নৈতিক ও আইনগত ভাবে পরিচালিত হলেই এর সমস্ত দায়মুক্তি হয়েছে তা বলা যায় না। যে পরিবেশে বা যে সমাজে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে সেই সমাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কিছু দায়বদ্ধতা জন্মায়। একটি সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান হল সেটাই যার ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ বহুবিধ অংশীদারদের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখে। একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র নিজেদের অংশীদারদের লাভের জন্যই কাজ করে না, সে তার কর্মচারি, সরবরাহকারী, বিক্রেতা, স্থানীয় জনগন ও সর্বপরি দেশ ও জাতির উন্নয়নের জন্যও কাজ করে।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই সিএসআর বা সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তাদের শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশের কিছু অংশ এই খাতে বরাদ্দ রাখছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই দায়বদ্ধতা পূরণের নামে বিভিন্ন প্রচারণামূলক কার্যক্রম, প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিযোগিতায় নেমে পরে এবং নিয়ম প্রতিপালনের উর্ধে চলে যায়। সেক্ষেত্রে সরকার আইন করে সেখানে সিএসআর নিয়ন্ত্রণ করে।

সামাজিক দায়বদ্ধতা শব্দটি পশ্চিমা বিশ্বে ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের দিকে প্রচলিত হওয়া শুরু করে। বড় বড় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এই ধরনের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেওয়ার জন্য স্টেকহোল্ডার কথাটির প্রচলন করে। এই শব্দটির অর্থ হল সমাজের সেই সকল মানুষ যারা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রভাবিত হন।

ইউরোপীয় কমিশন (২০০১; ২০০২; ২০০৬) সিএসআর-কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে, ' এটি একটি ধারণা যার দ্বারা কোন প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং অংশীদারদের সাথে মতবিনিময়ের ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়াবলী সম্পর্কে খেয়াল রাখে'। বেশিরভাগ সংজ্ঞাতেই সিএসআর-কে বিবেচনা করা হয় অংশীদারদের কাছে করা প্রতিষ্ঠানের একটি অঙ্গীকার হিসেবে। যেখানে প্রতিষ্ঠান তার অংশীদারদের কাছে অঙ্গীকার করে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই পদ্ধতিতে স্বচ্ছ ও নৈতিকতার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। সিএসআর- এর পেছনে মূল ধারণা হচ্ছে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লাভের জন্য নয়, ব্যবসা হবে সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়নের জন্যও।

সুতরাং, সিএসআর হচ্ছে:

১. এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের অংশীদার হবে এবং অগ্রগতিতে অবদান রাখবে।

২. একটি ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা ধারণা যেখানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ও পরিবেশগত ইস্যুকে তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করবে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীদারদেরকে এ প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভূক্ত করবে।

৩. একটি স্বেচ্ছামূলক কাজ, তবে জনসেবা বা দাতব্য কার্যক্রম হিসেবে সিএসআর গণ্য হবে না।

৪. তিনটি ইস্যুকে প্রাধান্য দিয়ে এর উৎপত্তি; মানুষ, পৃথিবী এবং মুনাফা।

প্রেক্ষাপট, অনুসরণীয় ও অনুশীলন

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সামাজিক দায়বদ্ধতা বাস্তবায়ন করতে বিশ্ব ব্যাংক, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই সংস্থাসমূহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখছে যেমন পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়, যেখানে অন্যরা তাদের মনোযোগ দিচ্ছে শ্রম ও মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে। বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান সিএসআর গ্রহণ করার মাধ্যমে পরিচিতি বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। তাই দিন দিন সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০০ সাল থেকে বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সিএসআর উদ্যোগ হিসেবে পরিচিত জাতিসংঘের গ্লোবাল কম্প্যাক্ট (ইউএনজিসি ২০১৩)-এ ১২০০০ এর উপর ব্যবসায়িক ও অ-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং ১৪৫ টি দেশ যোগদান করেছে।

বাংলাদেশে সিএসআর এর প্রেক্ষাপটঃ

বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলোর 'সিএসআর' কার্যক্রম ও কার্যবিধির প্রকৃতি এখন পর্যন্ত মূলত অস্পষ্ট। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিএসআর আধুনিক ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নিয়েছে, শুধু বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র বিশ্বে। বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু প্রতিষ্ঠান সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছে যার মধ্যে ব্যাংক, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, বহুজাতিক পন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫২ টি প্রতিষ্ঠান ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট স্বাক্ষর করেছে। রাজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান ১০% ট্যাক্স ছাড় পায়।

সরকার ও সিএসআর

সিএসআর শুধুমাত্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা গবেষকদের কাছেই গুরত্ব পাচ্ছে না, এটা সরকারেরও মনোযোগ আকর্ষণ করছে। সাম্প্রতিক বিষয়াবলীর ভিত্তিতে, পাঁচটি গুরত্বপূর্ণ ইস্যু খুঁজে পেয়েছে যার কারণে সরকার সিএসআর বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে। প্রথমত, ব্যবসায়িক উদ্যোগ সরকারের টেকসই উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ নীতির উদ্দেশ্য পূরণে সাহায্য করবে। এছাড়া পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য, যেমন মানব সম্পদ উন্নয়ন ও স্বেচ্ছাসেবী ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে সরকারকে সাহায্য করবে। দ্বিতীয়ত, সিএসআর নীতিমালাসমুহকে কঠোর আইনি বিধানের সম্পূরক হিসেবে ধরা হয় যেখানে বিশেষ করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন বিধানসমূহ রাজনৈতিকভাবে কাঙ্ক্ষিত হয় না। তৃতীয়ত, সরকার চায় এবং চেষ্টা করে যাতে এই ধরনের উদ্যোগ আপসের মাধ্যমে ও স্বেচ্ছায় গৃহীত হয়, যাতে আইনি বাধ্যবাধকতার প্রয়োজন না পড়ে। যেমন, টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় ব্যবসায়িদের অংশগ্রহণ। চতুর্থত, সিএসআর এর নমনীয় নীতি জনপ্রশাসনে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটায়, যা চিরায়ত নিয়ম থেকে সরে গিয়ে আরও বিস্তৃতি লাভ করে এবং অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়াকে নিজস্ব অথবা সহ-ব্যবস্থাপনায় পরিনত করে। সিএসআর কেবল নতুন বৈশ্বিক কর্পোরেশনের উপাদান নয় বরং এটি নতুন ক্রমবর্ধমান সামাজিক শাসনের একটি বৈশিষ্ট্য। পঞ্চম ও শেষত, সিএসআর এর ধারণা শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকেই পূর্ণবিন্যাস করে না, এটা ব্যবসা, সরকার এবং সমাজের মধ্যবর্তি ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্কও পূর্ণবিন্যস্ত করে।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমঃ

বাংলাদেশে একাধিক প্রতিষ্ঠান সিএসআর নিয়ে কাজ করছে- রহিম আফরোজ গ্রুপ গ্রামাঞ্চলে সৌর শক্তি ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষন ও স্বল্পমূল্যে সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সরবরাহ করছে, স্কয়ার গ্রুপ 'বাসক' নামক ভেষজ ঔষধ উৎপাদনে কৃষকদেরও বিনামূল্যে প্রশিক্ষন ও বীজ বিতরণ করে আর্থিক স্বচ্ছলতায় অবদান রাখছে, নাভানা গ্রুপ গুলশান অঞ্চলে রোড ম্যাপিং করেছে ঐ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজতর করার উদ্দেশে, মোহাম্মদিয়া গ্রুপ স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিনামূল্যে শিক্ষা ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান করছে শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের, সপুরা সিল্ক মিল্স গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করেছে, ইস্পাহানি গ্রুপ চক্ষু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে, জনতা ব্যাংক মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনমান উন্নয়নে সব রকমের সেবা দিচ্ছে এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক সেবা দিচ্ছে ।

সিএসআর এর মানদন্ড

আন্তর্জাতিক মানদন্ড

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিএসআর নীতিমালা করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য-

- ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট/ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপাল্‌স অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস,
- অরগানাইজেসন ফর ইকোনোমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট আইএলও (ওইসিডি),
- আইএলও ডিক্লারেশন অন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অ্যান্ড রাইট্‌স অ্যাট ওয়ার্ক,
- আইএসও ২৬০০০ গাইডেন্স অন সোস্যাল রিস্পন্‌সবিলটি-এর মতো কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সিএসআর এর যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিরলসভাবে বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিমালা প্রনয়নের কাজ করে যাচ্ছে।

ইউএন গ্লোবাল কম্প্যাক্ট

মূলনীতি

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সমিতি ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে
- সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম বর্জন
- শিশু শ্রমের কার্যকর বিলুপ্তি
- কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপাল্‌স অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপাল্‌স অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস-এর ১০টি মূলনীতি হল সিএসআর এর মূলনীতি, যার মধ্যে রয়েছে-

মানবাধিকার:

মূলনীতি ১.ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান; আর্ন্তজাতিক ভাবে ঘোষিত মানবাধিকারের সমর্থন, সুরক্ষা ও সম্মান করবে; এবং

মূলনীতি ২. নিশ্চিত করতে হবে তারা মানবাধিকার লংঙ্ঘন করছে না।

শ্রমিক:

মূলনীতি ৩. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষি করার অধিকার এবং স্বাধীনতা থাকতে হবে;

মূলনীতি ৪. সকল ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম; বর্জন।

মূলনীতি ৫. শিশু শ্রম কার্যকর বিলুপ্তি; এবং

মূলনীতি ৬. কর্মসংস্থান ও পেশার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ।

পরিবেশ:

মূলনীতি ৭. ব্যবসায় সমর্থন করা উচিত পরিবেশ রক্ষায় সর্তকতামূলক পদ্ধতি;
মূলনীতি ৮. বৃহত্তর উদ্যোগ গ্রহন করা উচিত পরিবেশের উন্নত করার ; এবং
মূলনীতি ৯. পরিবেশ-বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং প্রচার ও প্রসারে উৎসাহিত করা।

দুর্নীতি দমন:

মূলনীতি ১০. ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান; চাঁদাবাজি ও ঘুষ সহ সকল দুর্নীতির বিরুদ্ধে কাজ করা।

আইএলও ঘোষণা:

সিএসআর এর উপরে আইএলও এর দুটি প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়

১. কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতি ও অধিকার বিষয়ে আইএলও ঘোষণা: এটি আইএলও'র কেন্দ্রীয় শ্রমমান বাস্তবায়নের জন্য সরকারের উপর একরকম বাধ্যবাধকতা তৈরী করে।

এবং

২. বহুজাতিক উদ্যোগ ও সামাজিক নীতি সংক্রান্ত ত্রীপক্ষীয় ঘোষণা: এটি সরকার এবং আইএলওর সংগঠক ও অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি নির্দেশনা।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রা-এসডিজি:

জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ১ নং ও ৮ নং লক্ষ্য অনুযায়ী শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সিএসআর কার্যক্রম সফলভাবে কার্যকরী করা প্রয়োজন।

লক্ষমাত্রা ১. সব জায়গার সব রকমের দারিদ্র্য দুরীকরণ লক্ষমাত্রা
লক্ষমাত্রা ৮. টেকসই, অন্তর্ভূক্তিমূলক এবং সহনশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং সবার জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়া।

সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা:

সার্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা পত্রের ২৩(গ) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক কর্মীর তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম, এমন ন্যায্য ও অনুকুল পারিশ্রমিক এবং প্রয়োজনবোধে সেই সংগে সামাজিক সংরক্ষণের জন্য ব্যবস্থাদি লাভের অধিকার রয়েছে।
সিএসআর এর মাধ্যমে শ্রমিকের জীবনযাপনকে সহজ থেকে সহজতর করা সম্ভব।

আইএসও ২৬০০০- সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নির্দেশনা- আইএসও ২৬০০০ঃ ২০১০

সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক নির্দেশনাটি আকার ও অবস্থানের ভিত্তিতে সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে এবং এর সাতটি মূল বিষয়াবলী ও সাতটি মূল নীতি রয়েছে। টেকসই উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশগ্রহণ বিষয়ে সাহায্য করাই আইএসও ২৬০০০ঃ ২০১০ - এর উদ্দেশ্য। এটা তাদের আইনের বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে উৎসাহিত করে। আইন মেনে চলা একটি প্রতিষ্ঠানের অবশ্য কর্তব্য এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার অপরিহার্য অংশ। এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা প্রদান করে এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকে পরিপূর্ণ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগ গ্রহণ করে। আইএসও ২৬০০০ঃ ২০১০ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত নির্দেশনা প্রদান করে এবং এটা পাবলিক পলিসি কার্যক্রম হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

অন্যান্য দেশে সিএসআর

অধিকাংশ উন্নত দেশসমূহে (যেমন কানাডা, আমেরিকা, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ড) সিএসআর নীতমালা রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের মধ্যে শ্রীলংকায় সিএসআর বিষয়ক নীতিমালা রয়েছে। ভারতে সিএসআর বিষয়ক আইন রয়েছে। সেখানে সকল প্রতিষ্ঠান তাদের লভ্যাংশের ২% সিএসআর খাতে প্রদান করে।

জাতীয় মানদন্ড:

বাংলাদেশ সংবিধান অনুচ্ছেদ-১৫

এতে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।"

সংবিধানের আলোকে প্রত্যেক নাগরিকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়, যা বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্র এবং সরকারের। সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকের এই চাহিদা পূরণ করা যেতে পারে।

ভিশন-২০২১:

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত ভিশন-২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দারিদ্র্য সম্পূর্ণরুপে নিরসন ও বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা। এ লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সকল শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিত করা প্রয়োজন, যা সিএসআর এর আওতায় আনা যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর নীতিমালা:

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম ২০০৮ সালে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলোর অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব হিসেবে সিএসআর ব্যবস্থা চালু করে। তাই পেশাগত বাধ্যতামূলক অনুশীলন হিসেবে সিএসআর কে বাংলাদেশে নতুনই বলা যায়। তবে সিএসআর এর অস্তিত্ব বাংলাদেশের ব্যবসায় অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান।

বাংলাদেশ ব্যাংক সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করেছে।

পার্সস্পেকটিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০-২০২১:

পার্সস্পেকটিভ প্ল্যান অব বাংলাদেশ ২০১০ -২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১২১ সালের মধ্যে মাথাপিছু আয় ২০০০ ডলারে উন্নীত করা। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি খাতে কর্মরত প্রত্যেক শ্রমজীবী মানুষের জন্য একটি ন্যূনতম জীবনযাপন নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন এবং লক্ষিত সময়ের মধ্যে তা অর্জন করতে হলে সিএসআর কার্যক্রমকে জনপ্রিয় ও উৎসাহিত করতে হবে, যা পার্সস্পেকটিভ প্লান অব বাংলাদেশ ২০১০-২০২১ এ উল্লেখ আছে।

রাজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমের মাধ্যমে যে কোন প্রতিষ্ঠান ১০% রাজস্ব ছাড় পায়:

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সংশোধনঃ

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালনের ক্ষেত্রে করদাতা কোম্পানীকে ১০% কর রেয়াত প্রদান সংক্রান্ত ৪ জুলাই ২০১১ তারিখের এস.আর.ও নং-২২৯-আইন/আয়কর-২০১১ সংশোধন করে নতুন এস.আর.ও নং-১৮৬ আইন/আয়কর/২০১৪ তারিখঃ ১ জুলাই ২০১৪ জারী করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সিএসআর সংস্কান্ত নিম্নোক্ত সংশোধনী আনা হয়েছেঃ

১) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালন খাতে ৮ কোটির পরিবর্তে সর্বোচ্চ ১২ কোটি টাকার উপর আয়কর রেয়াত প্রযোজ্য হবে;

২) কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব (সিএসআর) পালন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে;

৩) বিদ্যমান ২২ টি খাতে সিএসআর কার্যক্রম সম্পাদন ছাড়াও কোন কোম্পানী কর্তৃক কোন বিশেষ দুর্যোগ বা টুর্ণামেন্ট বা জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত এবং সরকার অনুমোদিত তহবিলে প্রদত্ত অনুদানকেও সিএসআর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ বিধান ১ জুলাই ২০১৪ অর্থাৎ ২০১৫-১৬ কর বছর থেকে কার্যকর হবে।

বাংলাদেশের সিএসআর আইন:

সিএসআর বিষয়ে বাংলাদেশে কোন নির্দিষ্ট আইন নেই। বর্তমানে সিএসআর বিষয়টি নীতি নির্ধারকদের গোচরে এসেছে। ২০১৩ সালে সাভারে রানা প্লাজা ধসের পর সিএসআর এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে প্রশ্নবিদ্ধ ও সংশোধন করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই অনুচ্ছেদে কোম্পানি আইন ১৯৯৪ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়তে কর্পোরেট স্বপ্রবিধান সম্পর্কিত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬- কে একীভূত করা হয়।

বাংলাদেশ কোম্পানি আইন ১৯৯৪:

একটি কোম্পানি কিভাবে পরিচালিত হবে এবং সেই সাথে কোম্পানি, অংশীদার ও ব্যবস্থাপকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিধানসমূহ বর্ণনা করে কোম্পানি আইন ১৯৯৪। এই আইন ব্যবসার মালিক অথবা কর্পোরেট বোর্ড পরিচালকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কেও আলোকপাত করে। একটি কোম্পানির কর্পোরেট পরিচালনা পদ্ধতি, মালিকানা কাঠামো ও বৈশিষ্ট সম্পর্কে এই আইনের অনুচ্ছেদ ১০৪ এবং তফসিল ১ এ নির্দেশনা রয়েছে। পরিচালক অথবা ব্যবস্থাপকদের সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি এই আইনে সুনির্দিষ্ট করা নেই। এই আইন অনুসারে কোম্পানির পরিচালকরা প্রায় সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমের জন্য অংশীদারদের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন এবং খুব কম ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের দায়িত্বহীন ব্যবসা পদ্ধতির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবেন। এখানে কোম্পানির সিএসআর কার্যক্রম পরিমাপের দুটি পদ্ধতি উপস্থাপন করা হল। প্রথমত, কোম্পানিসমূহের প্রকাশিত সামাজিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও এইসব প্রতিবেদনে তথ্যের মান মূল্যায়নের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, সমাজ, পরিবেশ ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রয়োজনে সাড়াদানের ক্ষেত্রে কোম্পানির অভ্যন্তরিন কাঠামোর মূল্যায়নের মাধ্যমে। এই আইন অনুসারে, প্রতিটি কোম্পানিকে তার অর্থনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে যা কর্পোরেট নির্বাচকদের কাছে কর্পোরেট কার্যক্রম উপস্থাপনের একটি পরোক্ষ উদ্যোগ। এই আইন পরোক্ষভাবে প্রতিবেদনে ভূল, অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশের জন্য কোম্পানি পরিচালকদের দায়বদ্ধ করে কিন্তু এই আইনের কিছু সুরক্ষার কারণে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধতা কিছুটা দুর্বল হয়েছে। এই আইনের ১০২ ধারা অনুসারে, কোন কোম্পানি দায়িত্ব অবহেলা, অক্ষমতা কিংবা বিশ্বাস ভঙ্গের কারণে তার পরিচালক, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা কিংবা যে কোন লোকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। তা ছাড়া, এই আইন পরিচালকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান প্রদান করে না। এই আইনের ১৪৫ ধারা, অসত্য তথ্য প্রদানের জন্য পরিচালক ও কর্মকর্তাদের দায়ী করে কিন্তু প্রতিবেদন প্রস্তুতের সাথে জড়িত আইনজীবি, অডিটরসহ অন্যান্যদের দায় সম্পর্কে কোন নির্দেশনা নেই। অপরপক্ষে, এই আইনের কিছু বিধান পরিচালকদের দায় এর ক্ষেত্রে নমনীয় বা অসম্পূর্ন। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন প্রকাশিত প্রতিবেদনের অসত্য, অসম্পূর্ণ বা অপর্যাপ্ত তথ্যের উপর আইনি মামলা হয়, তবে পরিচালক বা কর্মকর্তাকে এর তদন্ত সাপেক্ষে সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া, অসত্য তথ্য প্রকাশ ও জালিয়াতির জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও অপর্যাপ্ত।

এছাড়া, বার্ষিক প্রতিবেদনে তাদের অ-আর্থিক কার্যক্রমের উপস্থাপন থাকে না। সম্প্রতি পরিবেশগত কারণে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে জ্বালানী ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক

করা হয়েছে। মূলত, এই আইন সামাজিক দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানসমূহকে কোন নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে বলে না এবং যেহেতু এই আইন প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল করে তুলবে তাই এই আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা ও অনুচ্ছেদসমূহ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর মূল শ্রম মানদন্ড অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় শ্রম আইন রয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬-এ শ্রমিকের অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হলেও প্রতিনিয়ত উৎপাদন শিল্পে শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত চারটি বৃহৎ শ্রমিক ইস্যু নিয়ে ৪৪ টি শ্রম সম্পর্কিত আইন ছিলঃ ক) মজুরী ও নিয়োগ, খ) ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প বিরোধ, গ) কর্ম পরিবেশ ও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং ঘ) শ্রম প্রশাসন ও শিল্প সম্পর্ক । বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, প্রায় সব আইন বাতিল করে একত্রে একটি আইনের আওতায় এনেছে। শ্রম আইন সহজিকরণে এবং একক শ্রম আইন প্রস্তুতিতে মালিক, শ্রমিক, সরকারি প্রতিনিধি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে সরকার শ্রম আইন কমিশন ১৯৯২ নামে একটি কমিশন গঠন করে। কমিশনের প্রতিবেদনকে ভিত্তি করে এবং মালিক ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালের ১১ অক্টোবর পূর্বের ২২ টি আইন বাতিল করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ পাস করে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-ই বাংলাদেশের শ্রম বিষয়ে প্রধান আইন। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সাতটি ব্যবসা শিল্প ক্ষেত্রের শ্রম আইনের সাপেক্ষে বিশ্লেষণ ও তুলনা করা হয়েছে। যেমনঃ এএস ৮০০০ আন্তর্জাতিক সামাজিক দায়িত্ব, নৈতিক ব্যবসা উদ্যোগের মূল আইন, ন্যায্য শ্রম সংস্থা, ন্যায্য পরিধান ফাউন্ডেশন, সম্মিলিত সামাজিক ব্যবসা উদ্যোগ, বিশ্বব্যাপী দায়িত্বশীল পোশাক উৎপাদন, কর্পোরেট দায়িত্ব ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় যৌথ উদ্যোগ। যদি বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান আইনটি ১০০ ভাগ মেনে চলে তাহলে একই সাথে সে সাধারণ আইনেরও ৮৫ শতাংশ পুরন করবে।

সরকারের সাম্প্রতিক উদ্যোগ:

শিশুদের জন্য জাতীয় 'ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা' নীতি-২০১৫, 'শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়' (খসড়া) করেছে। যেখানে শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ, কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি, শিশুশ্রম নিরসন, সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেবা প্রদান, শ্রমিকদের সন্তানদের উন্নয়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই কর্মসূচী গ্রহণ, দুর্যোগকালীন পূনর্বাসন, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির উন্নয়নে শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী সমাজের অবদান রাখার কথা বলা হয়েছে।

ব্যক্তি খাত:

সরকার স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুক্ত বাজার ব্যবস্থার দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাত উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ও অর্থনীতির বেশির ভাগ বিনিয়োগ এ খাত থেকে আসে এবং এ কারনে এ খাতকে প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রাথমিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে অবকাঠামো তৈরী, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যবসায় ও বিনিয়োগ বান্ধব করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে বড় একটি অবদান রয়েছে সেটাও সমান স্বীকৃত। ব্যক্তিখাতে ব্যবসায় এবং কর্পোরেশনের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং এদের মধ্যে কতগুলো সিএসআর কার্যক্রমে বড় অঙ্কের অর্থও সরবরাহ করে আসছে যা কিনা সময়মতো কর এর আওতায় আনা আবশ্যক।

ট্রেড ইউনিয়নের মতামত:

আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন:

আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দাবী সিএসআর কার্যক্রমকে জাতীয় শ্রমমান এবং জাতীয় শ্রম আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন এবং সিএসআর কার্যক্রমকে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম থেকে আইনের আওতায় আনতে হবে। সব কোম্পানিকেই সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় আনতে হবে। ট্রেড ইউনিয়নের উপর নেতিবাচক প্রভাব ব্যতীত সিএসআর কে ব্যবহার করতে হবে।

বাংলাদেশের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন:

সিএসআর কার্যক্রম আমাদের দেশে মূলত স্বেচ্ছাসেবী কাজ হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়ন এর পক্ষ থেকে মনে করা হয় এটা বাধ্যতামূলক। এটাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে সরকারী উদ্যোগ, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকসহ বিভিন্ন পক্ষ, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগসমুহকে সমন্বিত করা প্রয়োজন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সিএসআর করে, সেই সমস্থ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অংশীদার করতে হবে সিবিএ এর মাধ্যমে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ একা যেটা করবে সেটা হবে দান বা জনসেবামূলক কর্মকান্ড। সরকারী নীতি থাকা দরকার, সেই নীতি অনুযায়ী সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা হবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সিএসআর আলাদা বিভাগ থাকা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে তথ্য পেতে সবার সুবিধা হবে। আর কার্যক্রমেরও স্বচ্ছতা থাকবে। সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য বৎসরিক বাজেট থাকা উচিত।

ট্রেড ইউনিয়নের দৃষ্টিতে করপোরেট সংস্থাগুলোর সিএসআর কার্যক্রম:

- শ্রমিক কর্মচারীদের আর্থসামাজিক কল্যান সাধন করা সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে
- প্রত্যেক কর্মস্থলে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা
- অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা ও আইনানুগ ভাবে নিশ্চিত করা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে
- অন্যান্য করপোরেট সংস্থার মত গার্মেন্টস্ এ 'সিএসআর' কার্যক্রম থাকা আবশ্যক করতে হবে
- ট্রেড ইউনিয়ন ,শ্রমিক- কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা
- সিএসআর এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা
- সরকার ও প্রতিষ্ঠান কতৃক গণসচেতনতা কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহন করা সিএসআর ইস্যূতে

সিএসআর ব্যয় নয়, বিনিয়োগ

যে সমাজে ব্যবসায়ীরা পণ্য বিক্রি করে মুনাফা করে সে সমাজের প্রতি তথা ভোক্তা/ক্রেতার প্রতি ঐ কোম্পানিরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তাই ভোক্তা/ক্রেতার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য, শিক্ষার জন্য, কিংবা কোনো অবকাঠামো উন্নয়নেও কোম্পানি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। তাতে কোম্পানির ব্যাপক প্রচারের সুযোগ হয়। ক্রেতা ভোক্তাদের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপিত হয়। একটি সম্প্রীতি গড়ে ওঠে। এটি ব্যবসা প্রসারের হাতিয়ার।

আস্থা এমন এক বিষয় যা অর্জিত না হলে যত ভাল পণ্য বা সেবা বাজারে ছাড়ুক না কেন, ক্রেতারা নেবে না। ক্রেতাদের এই আস্থা অর্জনের জন্যও উন্নত বিশ্বে কর্পোরেট হাউজগুলো কিছু ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করে। এতে জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে তার ইমেজ বৃদ্ধি করে। নৈতিকতার বিষয়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া ক্রেতাগোষ্ঠীর জন্য মুনাফার কিয়দংশ ব্যয় করে ভালবাসার যোগ্য হয়ে উঠার সুযোগ তৈরির কৌশল গ্রহণ করা যায়। ক্রেতা তখন সহজে ঐ পণ্যে বিমুখ হয় না।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এটি মঙ্গলজনক হয়েছে। যেখানে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য, কিংবা সমাজের অনেক প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অর্থায়ন সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় না সেখানে সিএসআর কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়। সামাজিক অংশীদারিত্বের এই মডেল ভারসাম্য পরিবেশ গড়তেও সহায়ক হয়।

সিএসআরের চর্চা ব্যবসাকে টেকসই করার জন্যই। একটি কোম্পানি সামাজিক অগ্রগতিতে কী অবদান রেখেছে তার ওপর নির্ভর করে সামনের নতুন নতুন বাজার তৈরি এবং ব্র্যান্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য ব্যবসায়িক পরিকল্পনা। যে কারণে উন্নত বিশ্বে আগে থেকেই সিএসআর প্রথা চালু রয়েছে।

কার দায়িত্ব, কার প্রাপ্য

সিএসআর এর প্রয়োজনীয়তা

- সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে আধুনিক ব্যবসায়ে সিএসআর এর রয়েছে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা
- সিএসআর এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তার মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে
- প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সিএসআর স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার মাধ্যমে ব্যবসায় পরিচালনার অঙ্গীকারের অংশ
- ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মুনাফা নয়, বরং সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন-এটি সিএসআর এর ধারণা
- সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি বৃদ্ধি পায়
- ব্যবসায়, সরকার এবং সমাজের মধ্যবর্তী ভূমিকা এবং পারস্পরিক সম্পর্কও পূনর্বিন্যাস্ত করে

বাংলাদেশে সিএসআর পরিস্থিতি

- বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সিএসআর নীতমালা প্রণয়ন করেছে (২০১২) ।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয় শিশুদের জাতীয় ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করেছে (২০১৫)।
- সরকার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে ১০% কর রেয়াত প্রদান করছে। (এসআরও নং ১৮৬ আইন/আয়কর/২০১৪)
- বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রনালয় সিএসআর বিষয়ক একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে।

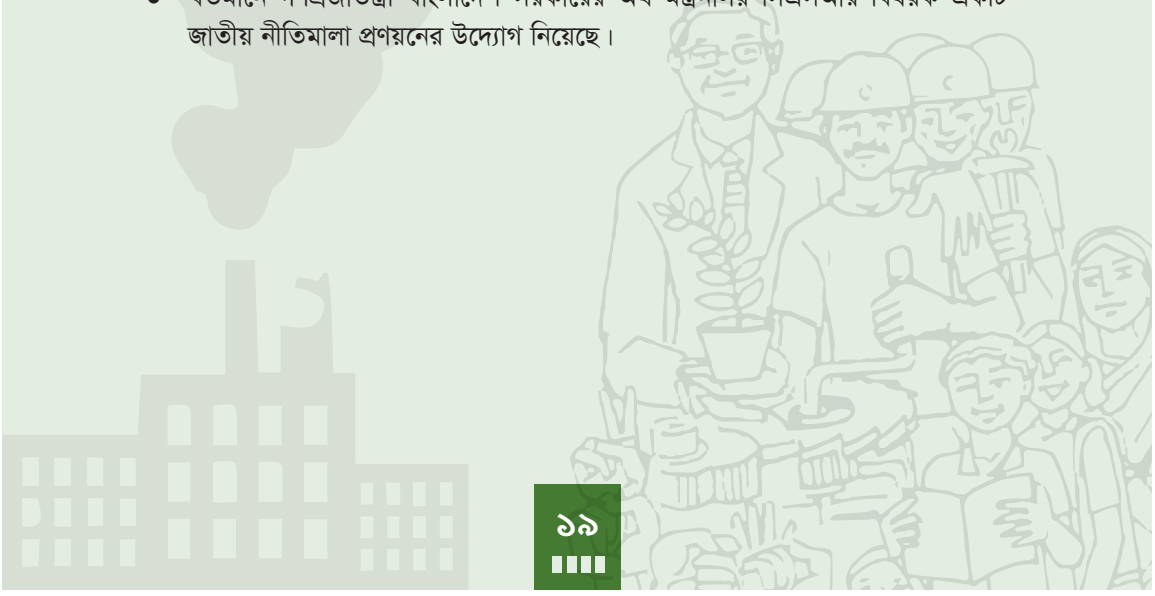

বিল্‌স এর 'সিএসআর' ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণের প্রেক্ষাপট

ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেহেতু সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য প্রধান উন্নয়ন অংশীদার সেহেতু সমাজের প্রতি রয়েছে তার দায়বদ্ধতা। এটি আর্ন্তজাতিক নীতি ও নিয়ম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রেসার গ্রুপ ও সহযোগী তৈরী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশে রয়েছে।

জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে এর গাইড লাইন্‌স অনুসরনের উদ্যোগ গ্রহন করা বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপুর্ণ। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশী পণ্য ও ব্যবসার অবাধ প্রসার ও প্রচলন নিশ্চিত করতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সহ অন্যান জোটের নির্ধারিত সামাজিক দায়বদ্ধতা নীতিমালা অনুযায়ী 'সিএসআর' কার্যক্রমের প্রচলন করাও জরুরী।

শ্রমিক ও কর্মচারী যারা শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অংশীদার তাদেরকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য এ্যাডভোকেসি করা এবং ডিসিশন মেকিং এ শ্রমিকদের অংশগ্রহন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

এ ক্ষেত্রে বিল্‌স ট্রেড ইউনিয়নকে সিএসআর বিষয়ে সাম্যক ধারনা প্রদান করতে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা সম্পর্কে ধারনা দিতে এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সাথে সফল আলোচনা বা দরকষাকষির জন্য প্রস্তুত করতে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করেছে।

বিলস এর সিএসআর কার্যক্রম

- "বাংলাদেশে সিএসআর কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণের সুযোগ" বিষয়ক একটি গবেষণা সম্পন্ন।
- বিল্‌স সিএসআর ইউনিট গঠন।
- বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, কর্মশালা।
- সিএসআর বিষয়ক জাতীয় নীতিমালায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিকরণে সুপারিশ প্রণয়ন।
- ভবিষ্যত এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা

বিভিন্ন পক্ষের সুপারিশ

বিল্‌স সিএসআর বিষয়ক কর্মশালা/আলোচনা সভা/মত বিনিময় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, মালিক, শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধির কাছ থেকে সিএসআর বিষয়ক নিম্নলিখিত সুপারিশ গ্রহণ করেছে :

১. সিএসআরকে বাধ্যতামূলক করা: সিএসআর কে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক করা উচিত।

২. সিএসআর-গাইডলাইন: সিএসআর গাইডলাইন তৈরী করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইনের আওতাভুক্ত করতে হবে।

৩. সিএসআর বিষয়ক আইন: আইন তৈরিতে ট্রেড ইউনিয়ন গুলোকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। অথবা শ্রমআইন এর সাথে সিএসআর কে যুক্ত করা বা আলাদা আইন হিসেবে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৪. সিএসআর-ট্রেড ইউনিয়ন: শ্রমিকের কল্যানে, শ্রমিকের অধিকার আদায়ে শ্রমিক প্রতিনিধির প্রয়োজন গুরুত্বপূর্ণ। তাই সিএসআর কার্যক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন মনিটরিং-এ থাকবে।

৫. সিএসআর-শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড: ''শ্রমিক-কল্যাণ ফান্ড'' ও ''সিএসআর ফান্ড'' দুটো আলাদা ফান্ড করতে হবে।

৬. সিএসআর খাত নির্ধারন: কোন কোন খাতে সিএসআর হিসেবে কত অর্থব্যয় হবে, কাদের জন্য ব্যয় হবে, কিভাবে ব্যয় হবে; নীতিমালায় তার স্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে।

৭. অগ্রধিকার ভিত্তিতে সিএসআর: নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, রি-রোলিং স্টিল মিল্‌স শ্রমিকদের জন্য অগ্রধিকার ভিত্তিতে সিএসআর করতে হবে।

৮. সিএসআর বোর্ড/কমিটি/টিম: সিএসআর কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য বোর্ড বা কমিটি বা টিম গঠন করতে হবে। সেখানে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ থাকবে।

৯. সিএসআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ: সিএসআর বিষয় সর্ম্পকে যথাযথ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. সিএসআর এর প্রচার: সবাইকে জানানোর জন্য প্রচার বৃদ্ধি করা দরকার। প্রচারের জন্য লিফলেট, বুকলেটের পাশাপাশি টেলিভিশনে সরকারীভাবে সচেতনতামূলক বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

১১. সিএসআর-এর মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান:সিএসআর এর মাধ্যমে শ্রমিকের পরিবার/শ্রমিক নিজে ও বৃদ্ধ বয়সে সব রকম চিকিৎসা ও চিকিৎসা সুবিধা পায় সেই ব্যাবস্থা করতে হবে।

১২. অন্যান্য সুপারিশঃ

ক. সিএসআর ফান্ড থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পেনশন, বাসস্থান ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. সিএসআর নীতিমালা যেন ট্রেড ইউনিয়নের সাথে সাংঘর্ষিক না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গ. সিএসআর থেকে শ্রমিকের প্রাপ্ত অর্থ তার মজুরীর সাথে প্রদান করতে হবে।

ঘ. সিএসআর কমিটিতে ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

ঙ. সিএসআর এর সুবিধা কারা পাবে তা নির্ধারণ করতে হবে।

চ. সব সেক্টরের শ্রমিকদের সিএসআর এর আওতায় আনতে হবে।

ছ. সিএসআর কার্যক্রম থেকে শ্রমিকদের পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

জ. সিএসআর এর মধ্যমে শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ঝ. ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণে সিএসআর ইউনিট করতে হবে।

ঞ. সিএসআর এর অর্থ সরকারী তহবিল গঠনের মাধ্যমে বণ্টন করতে হবে ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে।

ট. ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে সিএসআর আদায়ের জন্য সরকারকে চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

ঠ. বাংলাদেশ ব্যাংক এর গাইডলাইন ২০০৮ এ উল্লিখিত সিএসআর আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে।

ড. যে প্রতিষ্ঠানের দ্বারা যে সংক্রান্ত ক্ষতি হয়, তাকে সেই ক্ষতি পূরনে সিএসআর এর অর্থ ব্যয় করার নির্দেশনা দিতে হবে।